হেমেন্দ্রকুমার রায়

কল্পবিজ্ঞান রচনাসমগ্র ২

সম্পাদনা ও টীকা : প্রদোষ ভট্টাচার্য্য

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন্স

সম্পাদকের কথা

প্রথম খণ্ডেই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। হেমেন্দ্রকুমারের কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনিগুলি নতুন করে উপস্থাপিত করার জন্য উৎস-পাঠ্য হিসেবে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হয়েছে এশিয়া পাবলিশিং-এর প্রকাশিত ৩২ খণ্ডের 'হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী'। উক্ত সংস্থা হেমেন্দ্রকুমারের রচনাসমূহ জনসমক্ষে রাখার ব্যাপারে যা করেছেন, হেমেন্দ্র এবং সাহিত্য অনুরাগীদের তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কিন্তু তাঁদের পাঠ্য দুর্ভাগ্যক্রমে সব সময় ত্রুটিমুক্ত নয়। বিশেষ করে বর্তমান খণ্ডে 'কাচের কফিন' নামক কাহিনিতে এশিয়ার পাঠ্যে অনেক কিছু বাদ গেছে, চরিত্রদের কথোপকথন এবং বর্ণনামূলক, দু-রকম অংশেই! হয়তো এশিয়ার সম্পাদকমণ্ডলী এমন কোনো উৎস-পাঠ্য পেয়েছিলেন, যাতে এইসব অংশ বাদ ছিল। মনে পড়ে, ছোটোবেলায়, সম্ভবত শ্রীকালী প্রকাশালয় থেকে বের হওয়া 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ' কাহিনিতে লীলা নামক চরিত্রটির অনেক মুখের কথা আর পরিবারের শিশুদের মন ভোলানোর জন্য কাটা ছড়া বাদ গিয়েছিল, যা কাহিনিটি যখন শরৎ সাহিত্য ভবনের *আকাশদীপ* পূজাবার্ষিকীতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাতে ছিল। এবং বাদ গিয়েছিল কাহিনির এপিগ্রাফ বা সূত্রলিপি, 'Prepare therefore to listen to a strange story', যা হেমেন্দ্রকুমারের কাহিনির উৎস, ক্যাপটেন ফ্রেড্রিক উইলিয়াম মারিয়াটের The Phantom Ship উপন্যাসের উনত্রিশতম পরিচ্ছেদে Krantz নামক চরিত্রের বলা 'The White Wolf of the Hartz Mountains' গল্পটি থেকে উদ্ধৃত।

সৌভাগ্যক্রমে, একটি অখ্যাত প্রকাশনী সংস্থার গোয়েন্দা কাহিনিসংকলন-এ সম্পূর্ণ 'কাচের কফিন' পেয়েছি, এবং সেটিকেই উৎস-পাঠ্য হিসেবে ব্যবহার করেছি। সংকলনটি হেমেন্দ্রকুমার ১৯৬৩ সালে প্রয়াত হবার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাজারে বেরোয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ রচনা, 'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার'-এর দ্বাদশ পরিচ্ছেদে একটি জায়গায় হাঁহাঁ আর হুঁহুঁর কথোপকথনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হুঁহুঁর কিছু কথা বাদ চলে গেছে। কিন্তু, ছোটোবেলায় শ্রীকালী প্রকাশালয় থেকে বাবার কিনে-দেওয়া উপন্যাসটি আর খুঁজে পেলাম না। এশিয়া প্রকাশিত রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডেই এই ত্রুটি রয়েছে। নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে উক্ত জায়গায় শূন্যস্থান পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের প্রচেষ্টা থেকেছে, দুই খণ্ডেই যতটা সম্ভব শুদ্ধ পাঠ পাঠকদের হাতে তুলে দেবার। এবার তাঁরাই বিচার করবেন, কতটা সফল হয়েছি।

কলকাতা
জুলাই, ২০২৩

প্রদোষ ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

জয়ন্তের কীর্তি	৯
কাচের কফিন	৬৯
নবযুগের মহাদানব	৯৩
মানুষের গড়া দৈত্য	১২৭
মানব-দানব	১৭৬
অদৃশ্য মানুষ	২১৬
প্রশান্তের আগ্নেয়-দ্বীপ	২৬৭
অমানুষিক মানুষ	৩১৩
মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার	৩৮৪

জয়ন্তের কীর্ত্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রহস্যময় চুরি

সকাল বেলা। শীতকাল। খিড়কির ছোট বাগানের একপাশে, একখানা ইজি-চেয়ারে শুয়ে জয়ন্ত একমনে একখানা বিলাতী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছে আর তার গায়ের উপর দিয়ে, খেলা ক'রে যাচ্ছে, কাঁচা সোনার মত কচি রোদের মিষ্টি হাসিটুকু।

এমন সময় মাণিকলাল ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে ছুটে এসে বললে, "জয়, জয়—"

জয়ন্ত বই থেকে মুখ তুলে বললে, "হয়েচে কি? অমন ক'রে ছুটে আসচ কোত্থেকে?"

—"মুকুন্দ নন্দীর গদী থেকে।"

—"কিন্তু ছুটে আসচ কেন? কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেচে নাকি?"

ইজি-চেয়ারের হাতলের উপরে ব'সে প'ড়ে মাণিকলাল বললে, "হুঁঃ, আমাকে

মৌচাক পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রি.)

জয়ন্তের কীর্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ
রহস্যময় চুরি

সকালবেলা। শীতকাল। খিড়কির ছোটো বাগানের একপাশে, একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে জয়ন্ত একমনে বিলাতি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছে আর তার গায়ের উপর দিয়ে খেলা করে যাচ্ছে কাঁচা সোনার মতো কচি রোদের মিষ্টি হাসিটুকু।

এমন সময় মানিকলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে ছুটে এসে বললে, জয়, জয়—

জয়ন্ত বই থেকে মুখ তুলে বললে, হয়েছে কী? অমন করে ছুটে আসছ কোত্থেকে?

মুকুন্দ নন্দির গদি থেকে।

কিন্তু ছুটে আসছ কেন? কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে নাকি?

ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ে মানিকলাল বললে, হুঁঃ, আমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, এ অঞ্চলে এমন লোক তো কাউকে দেখি না। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আসছি তোমাকে একটা মস্ত খবর দেওয়ার জন্যে। কাল মুকুন্দ নন্দির গদিতে একটা রহস্যময় চুরি হয়ে গেছে!

জয়ন্ত সিধে হয়ে বসে বললে, রহস্যময় চুরি?

হুঁ। এই দ্যাখো খবরের কাগজ।

তুমি পড়ে শোনাও।

মানিকলাল খবরের কাগজ থেকে পড়ে শোনাতে লাগল:

রহস্যময় চুরি

গতকল্য গভীর রজনিতে বাগবাজারের শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল নন্দির গদিতে এক রহস্যময় চুরি হইয়া গিয়াছে। গদির কার্য শেষ হইয়া যাইবার পর মুকুন্দবাবু যথারীতি হিসাব মিলাইয়া শয়ন করিতে যান। গদিতে সেদিন অনেক টাকার কাজ হইয়াছিল এবং সে টাকা লোহার সিন্দুকের ভিতরে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। সিন্দুকের পাশেই মুকুন্দবাবুর এক কর্মচারী শয়ন করিয়াছিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া জানালা দিয়া দ্বিতলের উপর হইতে নিম্নতলে নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে জানালার নীচেই মেদিপাতার ঝোপ ছিল, তাই তাহার উপরে পড়িয়া লোকটি অজ্ঞান হইয়া

গেলেও তাহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। জ্ঞানোদয়ের পর তাহার আর্তনাদে গদির আর সকলকার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহার মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া মুকুন্দবাবু তখনই লোহার সিন্দুকের ঘরে যান। কিন্তু ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তখন দ্বার ভাঙিয়া ফেলা হয়। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সকলে দেখেন যে, লোহার সিন্দুকের দরজা ভাঙা, ভিতরে টাকাকড়ি কিছুই নাই। একটা জানলার চারিটা লোহার শিক দুমড়াইয়া কে বা কাহারা খুলিয়া ফেলিয়াছিল—শিকগুলি বাড়ির বাহিরে জানালার ঠিক নীচেই পাওয়া গিয়াছে। চোরেরা যে এই ভাঙা জানালা দিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। মুকুন্দবাবুর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সিন্দুক হইতে অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করিয়াছে।

জয়ন্ত সমস্ত শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা মানিকলাল, মাস তিনেক আগে ভবানীপুরের এক বড়ো জুয়েলারের দোকান থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অলংকার চুরি যায়, মনে আছে?

আছে। কিন্তু সে চুরির সঙ্গে এ চুরির সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু সে চুরির সঙ্গে এ চুরির মিল আছে অনেকটা।

হ্যাঁ, তা বটে। চোরেরা সেখানেও জানলার লোহার গরাদ ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল আর লোহার সিন্দুকের কপাট ভেঙে গহনা নিয়ে পালিয়েছিল—ঠিক কথা।

জয়ন্ত বললে, কেবল তা-ই নয়, একজন দারোয়ানকে ধরে তুলে এমন আছাড় মেরেছিল যে, তার প্রাণ প্রায় যায়-যায় হয়েছিল।

মানিকলাল উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক, ঠিক! তুমি কি বলো, সেই চোরের দলই কাল মুকুন্দ নন্দির গদিতে এসে হানা দিয়েছে?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, আমি এখন ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমি এখন খালি জানতে চাই যে, মুকুন্দ নন্দির সঙ্গে তোমার আলাপ আছে কি না?

মানিকলাল বললে, হ্যাঁ, অল্পস্বল্প আলাপ-পরিচয় আছে বই-কি! মুকুন্দবাবু আমাকে তো চেনেনই, তোমারও খ্যাতি তাঁর অজানা নেই। এইমাত্র আমি যখন গদি থেকে আসি, তিনিও আমার সঙ্গে তোমার কাছে আসতে চাইছিলেন।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো, তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই, একবার গদিটা দেখেই আসি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বেনামা চিঠি

এইবার আগে জয়ন্ত আর মানিকলালের একটুখানি পরিচয় দেওয়া দরকার।

জয়ন্তর বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না—তবে তার লম্বাচওড়া চেহারার জন্যে বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড়ো দেখায়। তার মতন দীর্ঘদেহ যুবক বাঙালি জাতির

ভিতরে বড়ো একটা দেখা যায় না—তার মাথার উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ভিড়ের ভিতরেও সে নিজেকে লুকোতে পারত না, সকলের মাথার উপরে জেগে থাকত তার মাথাই। রীতিমতো ডনবৈঠক, কুস্তি, জিমন্যাস্টিক করে নিজের দেহখানিকেও সে তৈরি করে তুলেছিল। বাঙালিদের ভিতরে সে একজন নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা বলে বিখ্যাত। আপাতত এক জাপানি মল্লের কাছ থেকে জুজুতসুর কৌশল শিক্ষা করছে।

মানিকলাল বয়সে জয়ন্তর চেয়ে বছর দুই-এক ছোটো হবে। নিয়মিত ব্যায়ামাদির দ্বারা যদিও তারও দেহ খুব বলিষ্ঠ, কিন্তু তার আকার সাধারণ বাঙালিরই মতন। ইচ্ছে করলেই সে আর পাঁচজনের ভিতরে গিয়ে অনায়াসেই আপনাকে লুকিয়ে ফেলতে পারত।

জয়ন্ত ও মানিকলাল দুজনেই এক কলেজে পড়াশোনা করত—কিন্তু নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের ফলে তারা দুজনেই কলেজি পড়াশোনা ত্যাগ করেছিল। তারা দুজনেই পিতৃমাতৃহীন, কাজেই স্বাধীন। দুজনেরই কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, কাজেই তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ও নেই।

ছেলেবেলা থেকেই তাদের ভারী শখ, বিলাতি ডিটেকটিভের গল্প পড়বার। এসব গল্প তারা একসঙ্গে বসেই পড়ত এবং গল্প শেষ হলে তাদের ভিতরে উত্তপ্ত আলোচনা চলত। এডগার অ্যালেন পো, গেবোরিও, কন্যান ডইল ও মরিস লেব্লাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের কাহিনি তো তারা একরকম হজম করেই ফেলেছিল এবং হাতে সময় থাকলে অবিখ্যাত লেখকদেরও রচনাকে তারা অবহেলা করতে পারত না। কিন্তু তাদের কাছে উপাস্য দেবতার মতন ছিলেন কন্যান ডইল সাহেবের দ্বারা সুপরিচিত ডিটেকটিভ শার্লক হোম্‌স।

একটি বোতাম, এক টুকরো কাগজ বা একটা ভাঙা চুরোটের পাইপের মতন তুচ্ছ জিনিস দেখে শার্লক হোম্‌স বড়ো বড়ো চুরির বা খুনের আসামিকে ধরে ফেলতে পারতেন, জয়ন্ত ও মানিকলাল রুদ্ধশ্বাসে তার সেই বাহাদুরির কথা পাঠ করত এবং বসে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত, তারাও যেন গোয়েন্দা হয়ে শার্লক হোম্‌সের মতন তুচ্ছ সূত্র ধরে বড়ো বড়ো চুরি-রাহাজানি খুনের কিনারা করে ফেলে লোকের চোখে তাগ লাগিয়ে দিচ্ছে।

এইভাবে আলোচনা করতে করতে ক্রমে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি এতটা বেড়ে উঠল যে, পাড়ার কয়েকটা ছোটোখাটো চুরির আসামিকে পুলিশের আগেই ধরে ফেলে সত্য সত্যই সবাইকে অবাক করে দিলে। তারপর একটা শক্ত খুনের কেসে তারা খুবই নামজাদা হয়ে পড়ল। পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সেই সময়েই কেসটা হাতে নিয়ে জয়ন্ত হপ্তাখানেকের ভিতরে খুনিকে ধরে পুলিশের কবলে সমর্পণ করেছিল!... এইরকম আরও চার-পাঁচটা জটিল চুরি ও খুনের রহস্য ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিকলালের নাম এখন চারদিকেই সুপরিচিত।

জয়ন্ত ও মানিকলাল এসেছে শুনে মুকুন্দবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাদের খুব আদর করে গদির ভিতরে নিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত বললে, আমাদের একেবারে চুরির ঘরে নিয়ে চলুন। আমি বাজে কথায় সময় নষ্ট

করতে চাই না।

যে ঘরে চুরি হয়েছিল, সে ঘরে ঢুকে জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে। ভাঙা লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করে বললে, আচ্ছা, এই সিন্দুক ভাঙার শব্দেও আপনাদের ঘুম ভেঙে যায়নি?

মুকুন্দবাবু বললেন, আমার ঘুম খুব সজাগ আর আমি পাশের ঘরেই থাকি। অথচ শুনলে আপনি অবাক হবেন যে, কাল আমার ঘুম ভাঙেনি!

আপনার যে কর্মচারী আহত হয়েছেন, তিনি এখন কোথায়?

হাসপাতালে!

কারা তাকে আক্রমণ করেছিল, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেছেন?

সে বিশেষ কিছুই বলতে পারেনি, কারণ অন্ধকারে সে কাউকেই দেখতে পায়নি। তবে যখন তাকে জানলা গলিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সে চকিতের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল যে, নীচে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

'হুঁ' বলে জয়ন্ত একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানলার আগে ছয়টা লোহার শিক ছিল, এখন মাত্র দুইটা অবশিষ্ট আছে। জয়ন্ত একটা শিক ধরে টেনে বুঝল, এরকম চার-চারটে শিক দুমড়ে খুলে ফেলা বড়ো সামান্য শক্তির কাজ নয়। হঠাৎ সেই শিকের এক জায়গায় তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। শিকটার লোহার গায়ে একটু চিড় খেয়েছে, এবং সেইখানেই একগোছা কটা চুল বা লোম আটকে রয়েছে। জয়ন্ত সাবধানে ও সযত্নে সেই চুলের গোছা টেনে নিয়ে একখানা কাগজে মুড়ে পকেটের ভিতরে রাখলে এবং একটি শামুকের নস্যদানি থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে নাকের ভিতরে গুঁজে দিলে।

মানিকলাল জানত, জয়ন্ত যখনই মনে মনে কোনো কারণে খুশি হয়ে ওঠে, তখন এক টিপ নস্য না নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু আপাতত তার খুশি হবার কোনো কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে, এগিয়ে এসে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী?

জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, একটা ভালো সূত্র পেয়েছি। বৈকালে বলব।

মুকুন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ও কী জয়ন্তবাবু, এখনই চললেন যে?

জয়ন্ত বললে, আমার যা জানবার তা জেনেছি। নতুন কিছু ঘটনা ঘটলে আমাকে তখনই জানাবেন।

মুকুন্দবাবু বললেন, অবশ্যই তা জানাব। জয়ন্তবাবু, আপনার শক্তির কথা আগেই শুনেছি। দেখবেন, আমাকে যেন ভুলবেন না। পুলিশের চেয়ে আমি আপনাকে বেশি বিশ্বাস করি। পুলিশ ঘুস খায়, আপনি খাঁটি লোক।

জয়ন্ত ফিরে রুক্ষস্বরে বললে, আমি খাঁটি লোক, আপনি তা জানলেন কী করে? মিছে তোষামোদ আমি ভালোবাসি না।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত বললে, মানিকলাল, বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করেই আবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো।—বলেই সে হনহন করে এগিয়ে গেল।

মানিকলাল নিজের বাড়ির পথ ধরে অগ্রসর হল। যখন সে প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ একজন লোক পিছন থেকে তার নাম ধরে ডাকলে।

মানিকলাল ফিরে দেখলে, কিন্তু তাকে চিনতে পারলে না।

লোকটা বললে, আপনারই নাম তো মানিকবাবু?

মানিকলাল ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

আপনার নামে একখানা চিঠি আছে, এই নিন!

মানিকলাল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলে। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়লে :

মানিকবাবু, আমাদের চোখ সর্বত্র। মুকুন্দ নন্দির গদিতে চুরি হইয়াছে তো আপনাদের কী? যদি প্রাণের মায়া রাখেন, এ ব্যাপার থেকে সরিয়া দাঁড়ান। না হলে, মৃত্যু অনিবার্য।

পত্রে লেখকের নাম নেই।

পত্র দেখে দৃষ্টি তুলে মানিকলাল দেখলে, যে চিঠি নিয়ে এসেছিল, সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে!

মানিকলালের আর নিজের বাড়িতে যাওয়া হল না, সে আবার জয়ন্তর বাড়ির দিকে ছুটল।

দুই হাতের উপর মুখ রেখে জয়ন্ত চুপ করে টেবিলের সামনে বসে ছিল।

মানিকলাল ঘরে ঢুকেই চিঠিখানা টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বললে, জয়, আর-এক নতুন কাণ্ড!

জয়ন্ত একটুও নড়ল না, চিঠির দিকে তাকিয়েও দেখলে না। সহজভাবেই বললে, চিঠিতে কী লেখা আছে, আমি তা জানি।

জানো?

হ্যাঁ। আমিও এখনই ওইরকম একখানা চিঠি পেয়েছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
একটি বেশি-খুশি মনুষ্য

মানিকলাল সবিস্ময়ে বললে, তুমিও এইরকম একখানি চিঠি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

যে চিঠি দিয়েছে, তাকে ধরতে পারোনি?

না। কিন্তু তার চেহারা দেখে নিয়েছি, তাকে আবার দেখলেই চিনতে পারব। তবে আমার বিশ্বাস, চিঠি সে লেখেনি, সে পত্রবাহক ছাড়া আর কেউ নয়।

তোমার এ বিশ্বাসের কারণ কী?

কারণ, চিঠিখানা এরই মধ্যে আমি কিছু কিছু পরীক্ষা করে দেখেছি।—এই বলে জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে মানিকলালের চিঠিখানাও তুলে নিলে, তারপর হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরটি হচ্ছে জয়ন্তর পরীক্ষাগার। মানিকলাল বুঝলে, তার চিঠিখানা ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যেই জয়ন্ত ও ঘরে গেল। সে চুপ করে বসে আজকের ঘটনাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল, কিন্তু কোনো সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলে না।

খানিকক্ষণ পরেই জয়ন্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্যমনস্কভাবে যেন নিজের মনেই বললে, না, কোনো সন্দেহ নেই—কোনো সন্দেহ নেই!

মানিক বললে, তোমার কথার অর্থ কী, জয়?

জয়ন্ত চেয়ারের উপরে বসে পড়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, এই চিঠি দুখানা যে লিখেছে, তার সম্বন্ধে কতকগুলি দরকারি কথা আমি জানতে পেরেছি।

যথা?

শোনো। পত্রলেখক বাঁ হাতে চিঠি লিখেছে। যাঁরা হাতের লেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তাঁরা সকলেই জানেন, ডান হাতের আর বাঁ হাতের লেখার ছাঁদ হয় আলাদারকম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পত্রলেখক বাঁ হাত ব্যবহার করেছে কেন? তুমি হয়তো মনে করবে, সে তার ডান হাতের লেখা লুকোবার জন্যেই বাঁ হাতে লিখে আমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনভ্যাসের জন্যে বাঁ হাতের লেখা এতটা পাকা হত না। সুতরাং তার বাঁ হাতের চিঠি লেখবার তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক, ও কারও কারও মতন হয়তো দুই হাতেই চিঠি লিখতে পারে। দুই, কারও কারও মতন তার হয়তো ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতই ভালো চলে। তিন, হয়তো তার ডান হাত নেই বা থাকলেও অকর্মণ্য, কাজেই তাকে বাঁ হাতে লেখার অভ্যাস করতে হয়েছে।

মানিকলাল বললে, আর কিছু জানতে পেরেছ?

জয়ন্ত বললে, পেরেছি বই-কি। ভালো করে লক্ষ করবার সময় পেলে তুমিও বুঝতে পারতে যে, পত্রলেখক ফাউন্টেন পেনে, সবুজ কালিতে লেখে। খাম আর চিঠির কাগজ কীরকম পুরু আর দামি, দেখেছ তো? সাধারণ লোক চিঠি লেখার জন্যে এত অর্থ ব্যয় করে না, আবার অনেক ধনী লোকেও করে না; সুতরাং পত্রলেখক কেবল ধনী নয়, বিলাসীও। এই চিঠি লিখে সে মস্ত ভ্রম করেছে, আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি, সে বাঙালি, ধনী, বিলাসী আর বাঁ হাতে লেখে। অপরাধীকে ধরবার জন্যে আমাদের আর কলকাতার নানান জাতের লোকের পিছু নিতে হবে না।

মানিকলাল বললে, কিন্তু কলকাতায় বাঙালির সংখ্যাও তো কম নয়।

জয়ন্ত টেবিলের উপরে নস্যদানিটা ঠুকতে ঠুকতে বললে, মানিক, আমি আরও কিছু কিছু দরকারি কথা জানতে পেরেছি। অপরাধী যদি ইউরোপের লোক হত তাহলে কখনও চিঠি লিখে আমাদের এমন করে শাসাতে সাহস করত না। ইউরোপের পুলিশকে বিজ্ঞান এখন শাসন করে। চোর-ডাকাত-খুনিদের বিরুদ্ধে সেখানকার পুলিশ এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসে প্রমাণ সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত ছোটোখাটো কোনো জিনিস দেখেও অনেক রহস্য ধরে ফেলা যায়। পত্রলেখক আমাকে চেনে, কিন্তু আমারও যে কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে—এটা জানলে সে চিঠি লেখবার সময় আরও বেশি সাবধান

হত! মানিক, পত্রলেখক হচ্ছে হয় রাসায়নিক, নয় তার টেবিলের উপরে নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে।

তা-ই নাকি, তা-ই নাকি?

হ্যাঁ। আমি খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম, চিঠির খামের পিছনদিকে তিন-চাররকম রাসায়নিক চূর্ণ লেগে রয়েছে, সাদা চোখে তা দেখা যায় না। খুব সম্ভব, পত্রলেখক জল দিয়ে খাম এঁটে সেখানাকে টেবিলের উপরে চেপে ধরেছিল—লোকে প্রায়ই যা করে থাকে। সাদা চোখে অদৃশ্য ওইসব রাসায়নিক চূর্ণ তার টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিল, তারই কিছু কিছু খামের গায়ে লেগে গিয়েছে।

মানিকলাল চমৎকৃত হয়ে বললে, এ যে আলিবাবার গল্পের কুনকের সঙ্গে মোহর উঠে আসার মতো হল!

হ্যাঁ, প্রায় সেইরকমই বটে। এখন বুঝে দ্যাখো, কোনো সাধারণ লোকের টেবিলেই নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে না। সুতরাং আমাদের এই প্রেরক যে কেমিস্ট্রি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানিক, সে বাঁ হাতে ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লেখে আর আমাদের কার্যকলাপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করে।

মানিকলাল বললে, তাহলে এটাও বুঝতে হবে যে, সে আমাদেরও নাগালের বাইরে নেই।

জয়ন্ত বললে, এই চিঠি দুখানিই সে প্রমাণও দিচ্ছে!

মানিকলাল হাসতে হাসতে বললে, এইবারে আমার মাথাও একটু একটু করে খুলছে। মুকুন্দ নন্দির গদিতে আমরা বেশিক্ষণ ছিলুম না। কিন্তু আমরা বাড়ি আসবার পথেই এই চিঠি দুখানা পেয়েছি। পত্রলেখক নিশ্চয়ই খুব কাছেই ছিল!

জয়ন্ত বললে, খুব কাছে—হ্যাঁ, কাছের এক বাড়িতে।

মানিকলাল বললে, বাড়িতে?

নিশ্চয়! বাড়ির নামে তুমি যখন সন্দেহ করছ, তখন তোমার বুদ্ধি খুলতে এখনও দেরি আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা গাড়িতে বসে চিঠি লিখলে খামের পিছনে ওই রাসায়নিক গুঁড়োগুলো উঠে আসত কি?

মানিক উৎসাহভরে বলে উঠল, ঠিক, ঠিক, ঠিক! অপরাধী তাহলে বাগবাজারেই থাকে, তাকে গ্রেফতার করা শক্ত হবে না!

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, এত সহজেই উৎসাহিত হোয়ো না মানিক! চারে মাছ থাকলেই সে যে ডাঙায় উঠবে, এমন কোনো কথা নেই। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, অপরাধী চিঠি লিখে অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। কিন্তু ও কথা এখন থাক, আমার আর-একটা আবিষ্কারের কথা শোনো। দ্যাখো দেখি, এটা কী? এই বলে সে টেবিলের উপর ছোটো একটি কাগজের মোড়ক তুলে মানিকের দিকে এগিয়ে দিলে।

মোড়ক খুলে মানিক দেখলে, এক টুকরো শুকনো মাটি।

জয়ন্ত বললে, কিছু বুঝতে পারছ?

টীকা

প্রথম প্রকাশ

মৌচাক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রি.) থেকে ফাল্গুন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ খ্রি.)। দেব সাহিত্য কুটীর থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৯৩৭-এ। এশিয়ার *রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, ৯-১০০।

বিষয়বস্তু

বছরের হিসেবে বার্ধক্যপ্রাপ্ত কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যৌবনের শক্তি অটুট রেখে কিছু দাগি অপরাধীকে দিয়ে চুরি, ডাকাতি, এবং প্রয়োজনে নরহত্যা। সেখানেও বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, যেমন লোহার সিন্দুক খুলতে oxyacetylene torch, মানুষ মারতে হাইড্রোজেন আর্সেনাইড গ্যাসভরা কাচের বাল্‌ব। অপরাধীদের দেহগুলি, কুকর্ম সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, কাচের কফিনে নিদ্রামগ্ন করে রাখা।

কল্পবিজ্ঞানের উপাদান

'বিজ্ঞান যে স্বপ্ন দেখেছে, ভবতোষ তাকে সত্যে পরিণত করেছে!' (৫১) 'বৈজ্ঞানিকেরা চিরস্থায়ী মানব দেহের স্বপ্ন দেখেছেন বটে, কিন্তু কোন অজানা মানুষ নিজের পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সেই স্বপ্নকে গোপনে... সত্য করে তুলেছে।' (৫৬)

জয়ন্ত-মানিকের প্রথম কাহিনি, *জয়ন্তের কীর্তি* হল, লেখকের ভাষায়, 'আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরাধের কাহিনী, এবং বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নতুন।' এর পরের বাক্যেই, অধ্যাপক অনীশ দেবের সংজ্ঞা অনুযায়ী, কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকার আবশ্যিকতার ব্যাপারে হেমেন্দ্রকুমার বলেছেন, 'কতকগুলি সত্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই [উপন্যাসের আখ্যান] কল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষের দেহকে জিইয়ে রেখে তাকে যে মৃত্যু ও বার্ধক্যের কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে... বহু পরীক্ষার পর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরা ঐ অভাবনীয়... সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য, কি ওদেশে ও কি পাশ্চাত্ত্য দেশে, ঐ বিচিত্র তথ্য বা আবিষ্কার নিয়ে আজ পর্যন্ত উপন্যাস লেখবার কল্পনা আর কোন লেখক করেছেন বলে জানি না।' (৬১) আখ্যানের সমর্থনে জয়ন্ত এনেছে অস্ট্রিয়ার Eugen Steinach (১৮৬১-১৯৪৪)-এর প্রসঙ্গ, যিনি অস্ত্র-চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরের শুকিয়ে-যাওয়া

রসগ্রন্থি বা gland-এর বিধানতন্তুসমূহ বা tissue আবার কার্যক্ষম করার চেষ্টা করেছিলেন, বা রাশিয়ান বংশোদ্ভূত ফরাসি Serge Voronoff (১৮৬৬-১৯৫১)-এর কথা বলেছে, যিনি বাঁদরের বিধানতন্তু বয়স্ক মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে তাকে তরুণ করার চেষ্টায় খানিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। জয়ন্ত রাশিয়ায় বরফের তলায় অশিলীকৃত অরণ্যের আবিষ্কারের কথাও উল্লেখ করেছে। সবার পরে এসেছে ১৯১২-তে দেহতত্ত্ব এবং/অথবা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী Alexis Carrel (১৮৭৩-১৯৪৪)-এর বক্তব্য। তিনি একটি মুরগির ভ্রূণাবস্থিত হৃদয় তাঁর Pyrex ফ্লাস্কে বিশ বছর ধরে জীবিত রেখেছিলেন, হৃদয়টিকে নিয়মিত পরিপোষক পদার্থ সরবরাহ করে। জয়ন্তর বক্তব্য শুনে মানিক বুঝতে পারে যে, ভবতোষও কোনো রাসায়নিক ওষুধের মাধ্যমে মানুষের দেহকে ঘুম পাড়িয়ে কাচের কফিনে গুদামজাত করবার উপায় আবিষ্কার করেছে।